উদ্ভিদ পরিচিতি,
গণিতবিদ হরিশচন্দ্র,
অন্ধকার দূরীকরণে,
বিজ্ঞান প্রদর্শনী মতামত,
চূর্ণির দূষণ চিত্র

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ১ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য

পদার্থ ও হিগস্ বোসন

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্ব পদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তাছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আর সূক্ষ্ম বা আরো স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশী।'

—*বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রায় একশ বছর আগে আমাদের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে। বিংশ শতাব্দি অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দিতে যেখানে বিজ্ঞান দুর্বার গতিতে তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে সেই সময়েই এই কথাগুলি প্রায় একইরকম ভাবে সত্যি। নিজের ইন্দ্রিয়জ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে মানুষ একের পর এক জটিল

এরপর 2 পাতায়

ঘরের বাতাস দূষণের শিকার

জন বিস্ফোরণ বা যৌথ পরিবার ভেঙ্গে নিউক্লিয়ার পরিবার বা দূরদেশে কর্মস্থল হওয়ায় আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি। সাধ্যে না কুলোলেও সাধ থাকায় নানা স্থানে সুবিধামত ছোট্ট এক ফালি জমির উপর ঘর বাড়ি অনেকেই করে ফেলে। অনেকে সারাটা জীবন ভাড়া করে কাটিয়ে দেয়। প্রমোটাররা আবার নানা সুবিধা - জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, ব্যাঙ্ক, স্কুল কলেজ, পোষ্ট অফিস, চিকিৎসা প্রভৃতি পরিষেবার দিকে লক্ষ্য রেখে বহুতল বাড়ি তৈরি করে। ব্যবসার জন্য মানে ভাড়াটিয়া রেখে রোজগারের জন্য ছোট ছোট ঘর, নীচু ছাদ ইত্যাদির ঘর বেশি দেখা যায়। সত্যি বর্তমানে বেশি দামের ঘর ভাড়াটিয়া কমই পাওয়া যায়। ঘরগুলিতে ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে শোয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্না ঘর, খাওয়ার ঘর, বাথরুম ও এক চিলতে বারান্দা। শোয়ার ঘরের পাশেই রান্নাঘর, বাথরুম প্রভৃতি। বসার ঘরে অতিথি অভ্যাগতদের জন্য সুদৃশ্য কার্পেট। ছোট ছোট ফুলদানিতে ফুল সাজানো। তাছাড়া ছোট ঘরে বহু জিনিস গুছিয়ে রাখতে হয়।

এরপর 4 পাতায়

পিঁপড়েদের সমাজ জীবন

(মে-জুন ২০১২) সংখ্যায় শ্রী কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পিঁপড়ের নানা কথা' প্রবন্ধটি পড়ে বেশ ভালো লাগল এবং অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে পিঁপড়েদের সমাজ জীবন নিয়ে লিখলাম— শৈবাল কুমার গুহ)

পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। এরা সাধারণত মাটির নিচে কলোনী বা উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখানে এক সঙ্গে ছোট-বড় অসংখ্য পিঁপড়ে দল বেঁধে মিলেমিশে বাস করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং একে অপরকে সাহায্য করে। এরা নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি করে না। এটা এদের একটা মস্ত বড় গুন। এরা সব সময় খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। দেহে কিংবা বাসায় কোনো জায়গায় কোন রকম ময়লা জমতে দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে।

রানী পিঁপড়ে শুধু ডিম পাড়ে, সন্তানদের কোনরকম খোঁজ খবর রাখে না। শ্রমিকরাই রানীর পরিচর্যা করে এবং সন্তানদের প্রতিপালন করে। পুরুষরা কোন কাজ করে না, সব সময় অলস জীবন যাপন করে এবং বসে বসে খায়। রানীর ডিমগুলি নিষিক্ত করাই তার একমাত্র কাজ।

শ্রমিক পিঁপড়ে, কোনো জায়গায় খাদ্যের সন্ধান পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আগে নিজে পেট ভরে খায়, তারপর যতটা পারে খাবার বয়ে এনে বাসায় গিয়ে অন্যান্য পিঁপড়েদের ঐ খাবারের সন্ধান দেয়। তখন দলে দলে পিঁপড়ে সেদিক পানে ছুটে যায়।

বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে যে, ঐ পিঁপড়ে তার চলার পথে হুলের মাধ্যমে এক প্রকার দ্রব্য ফেরোমেনে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। আর অন্যান্য পিঁপড়েরা সেই গন্ধ শুঁকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়।

এইভাবে অন্যান্য পিঁপড়েরা সেখানে গিয়ে প্রত্যেকেই যতটা

এরপর 4 পাতায়

পদার্থ ও হিগস্

1 পাতার পর

পরীক্ষা চালাচ্ছে এই 'না দেখা' জগৎ সম্পর্কে অবহিত হতে। আর এ প্রসঙ্গেই আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যয়বহুল এবং সবচেয়ে বেশী আলোচিত যে গবেষণা চলছে তা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে ইতিমধ্যেই আমরা জানি। জেনিভা শহরের অদূরে European Organization for Nuclear Research (CERN)এর অতিকায় যন্ত্রে চলছে কিনা পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন না জানা তথ্যের সন্ধানে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এই পরীক্ষা সম্পর্কিত কথা বলতে গেলে প্রথমে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক ধারণা যা এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে 'বিগ-ব্যাং' (Big Bang) এর ফলে। Big Bang এর বাংলা প্রতিশব্দ বলা যায় 'বৃহৎ বিস্ফোরণ', যার ফলে একটি বিন্দুতে ঘনীভূত মহাবিশ্বের সমস্ত ভর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল; সৃষ্টি হল গ্যালাক্সি, নক্ষত্রমন্ডল নিহারীকা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু। প্রকৃত পক্ষে দেশকাল এর উৎপত্তিও সেই থেকেই। তাই বলা যায় বিগ-ব্যাং এর সময় থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সময় এর সূচনা হল। আর সেই সময়কার অকল্পনীয় চাপ, তাপ প্রভৃতির প্রভাবে বিপুল পরিমান শক্তি পরিবর্তিত হয়ে জন্ম নিল বিভিন্ন জাতের কণা, যার মধ্যে অধিকাংশই তৎক্ষনাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন কণায় পরিণত হল। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এই নতুন কণাগুলি থেকেই সৃষ্টি হল পরমাণু-অণু বিভিন্ন পদার্থের। এভাবেই জন্ম নিল নিহারীকা, ধূমকেতু, নক্ষত্র, গ্রহ প্রভৃতি যা ওই বিভিন্ন পদার্থের অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরী।

'বিগ-ব্যাং' তত্ত্বই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিণতি ব্যাখ্যা করার জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং অধিক স্বীকৃত তত্ত্ব। আর এই 'বিগ ব্যাং'-কে ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীরা আবার একাধিক মডেলের কথা বলে থাকেন। আসলে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান এভাবেই কোনো তত্ত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে পাল্টা তত্ত্ব, এসবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে। Experimental Scientist দের হাতে কোনো তত্ত্ব প্রমাণিত হতে হয়তো দশকের পর দশক সময় লেগে যায়। আর এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল হল। পদার্থবিদ্যা বিশ্বাস করে যে ১৪ লক্ষ কোটি বছর আগে 'বিগ-ব্যাং' এর ফলে যে পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে ১২টি পরমাণুতর কণা এবং ৬টি বল বহনকারী কণার সমন্বয়ে সৃষ্ট। আবার সমস্ত মৌলিক কণা দুই প্রকার ঃ- বোসন এবং ফের্মিয়ন। ধর্ম অনুযায়ী কিছু বোসোন এবং কিছু ফের্মিয়নকে হ্যাড্রন বলে, যেমন : প্রোটোন, নিউট্রন, মেসন এরা এই হ্যাড্রন গোত্রের। CERN এর গবেষণাগারে তৈরী অতিকায় যন্ত্রটিতে (যা ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড সীমানায় মাটির নীচে ২৭ কিলোমিটার পরিধির এক সুড়ঙ্গে একাধিক ডিটেক্টর ও আরো অসংখ্য জটিল যন্ত্রাংশ সহযোগে নির্মিত পরস্পর বিপরীত দিক থেকে দুটো আসা এই হ্যাড্রন জাতীয় কণা (আপাততঃ প্রোটোন)-র মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হচ্ছে বলে যন্ত্রটির নাম প্রায় আলোর গতিবেগে ছুটে আসা এই প্রোটোনের সংঘর্ষে যে বিপুল পরিমাণ তাপ এবং চাপ সৃষ্টি হয় তা একমাত্র 'বিগ ব্যাং' এর সময়কার অবস্থার সাথে তুলনীয়। বিজ্ঞানীদের দাবী সেখানে মুহূর্তের জন্য সৃষ্ট তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ ডিগ্রী বেশী। পরক্ষণেইপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সাহায্যে এই দানবীয় তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থাও এই এল.এইচ.সি.তে আছে। তাই এল.এইচ.সি. একই সাথে ব্রহ্মাণ্ডের উষ্ণতম ও শীতলতম স্থানও বটে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা এই সংঘর্ষে যেহেতু 'বিগ ব্যাং'-এর সময়কার অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় তাই এমন কিছু কণা যা এখনো অনাবিষ্কৃত, যা সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ সময় স্থায়ী, যা 'বিগ ব্যাং এর সময় পদার্থ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এমন কণার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে ধরে ফেলা সম্ভব হবে। আমাদের আলোচিত ১২টি, এবং এবং ৬টি সহ যে ১৮টি কণার কথা বলা হয়েছিল তার মধ্যে ১৭টির অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হলেও শেষ কণাটি (যাকে হিগস্ বোসন বলা হচ্ছে)-র কোনো প্রমাণ এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই এতদিন ছিল অসম্পূর্ণ। অবশেষে গত ৪ঠা জুলাই CERN এর ডিরেক্টর জেনারেল রল্ফ হয়্যার -এর মুখ থেকে শোনা গেল সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা। তারা খুঁজে পেয়েছেন হিগস্ বোসন সদৃশ কণা, যা প্রোটোনের তুলনায় প্রায় ১৩৩ গুন ভারী। এইভাবে বাস্তব রূপ পেল Standard-Model এর ধারণা।

কিন্তু কেন এই হিগস্ বোসন? আর এর আবিষ্কারে এতো আনন্দেরই বা কি আছে? এই হিগস্ বোসন কথাটি এসেছে ইংরেজ পদার্থবিদ পিটার হিগস-এর নাম অনুসারে, যিনি অপর আরো দুই দল বিজ্ঞানীর মতন প্রায় একই সময়ে এক বিশেষ ধরণের কণার অস্তিত্বের দাবী করেছিলেন। সালটা ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ তারা ঐ বিশেষ কণা যা নাকি অন্যান্য প্রাথমিক কণার তুলনায় অত্যন্ত ভারী, তার কিছু ভৌত ধর্মের কথা তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলেন। ১৯৬৪ সালে লেখা ঐ তিনটি গবেষণাপত্রের প্রত্যেকটিকেই 'ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার' জার্নালের সুর্বণজয়ন্তী বর্ষে দিক নির্দেশক গবেষণাপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর সেই গবেষণাপত্রের ছয়জন লেখককে ২০১০ সালে সম্মানীয় জে. জে. সাকুরাই পুরস্কারে ভূষিত করা হয় তাত্ত্বিক কণা পদার্থবিজ্ঞানে তাদের মূল্যবান গবেষণার জন্য। তবে প্রায় ছয়জন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ প্রায় একই সাথে এই ভর প্রদানকারী কণার কথা বললেও কেন কেবলমাত্র হিগস্-এর নাম অনুসারে এই কণার নামকরণ, তা নিয়ে অবশ্য সত্যিই তর্কের অবকাশ আছে।

নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত পদার্থবিদ লিও ল্যাডারম্যানের ভাষায় "আমরা... বর্তমানে Standard-Model এর কথা জানি যা পদার্থ বিজ্ঞানের সকল সত্যকে কিছু কণা এবং চারটি মুখ্য বলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারে। .... এই তত্ত্বের কঠিন - বিজয়ী - সারল্য (...এবং...) অপরিসীম নির্ভুল গণনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বটি আভ্যন্তরীন দিক

এরপর 3 পাতায়

পদার্থ ও হিগস্

2 পাতার পর

দিয়ে অসম্পূর্ণ। .... এই বোসন কণাটি বর্তমান পদার্থবিদ্যায় পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবার কণাটি এতো ভ্রান্ত যে আমি এর একটি ডাকনাম রেখেছি, ঈশ্বর কণা।''

ল্যাডারম্যানের লেখা বৃহৎ গদ্যের এই খাপছাড়া কয়েকটি লাইন থেকেই আপাতভাবে পদার্থবিদ্যায় হিগস্ বোসনের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। অর্থাৎ Standard-Model এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কণা, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহে না হলে পদার্থের সৃষ্টি সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব আবার নতুন করে ভাবতে হতো। আসলে এই হিগস্ বোসন হল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ভারী যা হিগস্ ক্ষেত্র-এর সাথে সম্পর্কিত এবং যা হিগস্ ক্ষেত্রের উত্তেজিত অবস্থার ক্ষুদ্রতম কোয়ান্টামও বটে। আর আধুনিক পদার্থবিদ্যায় হিগস্ কৌশল-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় কি করে কিছু কণা প্রতিসাম্য বিঘ্নের মাধ্যমে ভর লাভ করে। বিখ্যাত পদার্থবিদ ডেভিড মিলার হিগস্ ক্ষেত্র বোঝাতে একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন। মনে করা যাক একটি রাজনৈতিক কর্মী সমাবেশে কর্মীরা ঘরে ইতস্তত: ছড়িয়ে রয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি সহজেই সেই ভিড় অতিক্রম করে ঘরের একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যেতে পারে, যা পদার্থবিদ্যায় কোনো ক্ষেত্র এবং ভরহীন ফোটোনের সাথে তুলনীয়।

কিন্তু যদি ঘরে অপর কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি (ধরা যাক কোনো রাজনৈতিক নেতা) প্রবেশ করে তবে রাজনৈতিক কর্মীরা তাকে ঘিরে ধরায় তার গতি মন্থর হয়ে আসবে। মিলারের মতে তা ভরযুক্ত কণার গতির সাথে তুলনীয়। আর এভাবেই হিগস্ ক্ষেত্র শোষণ করে কোনো কণা ভর লাভ করে।

এতো গেল কণা পদার্থবিদ্যায় হিগস্ বোসনের গুরুত্ব। কিন্তু এল.এইচ.সি. তে এই ভর প্রদানকারী কণার অস্তিত্ব প্রমাণের পথটি কিন্তু খুব সোজা ছিল না। কারণ কেবলমাত্র উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণার সংঘর্ষেই এই কণা সৃষ্টি হতে পারে এমন নয়। পুরো প্রক্রিয়াটিই নির্ভর করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণার প্রকৃতি এবং তার সংঘর্ষের উপর। আর এক্ষেত্রে প্রতি দশ লক্ষ কোটি সংঘর্ষে কেবলমাত্র একটি হিগস্ বোসন তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি সত্যিই হিগস্ বোসন উৎপন্ন হয় তবে তার স্থায়িত্ব হবে ১.৬×১০^{-২২} সেকেন্ড অর্থাৎ সেকেন্ডের এক ভাগের কোটি কোটি ভাগের ও অনেক অনেক কম সময়। এই প্রতিবন্ধকতা মাথায় ২০০০ সালের আগে পর্যন্ত CERN এ যে Large Electron-Positron Collider (LEP) তৈরী হয়েছিল তা নির্ভুলভাবে হিগস্ বোসনের অস্তিত্ব ধরতে পারেনি। দরকার ছিল আরো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংঘর্ষ যন্ত্র ও প্রয়োজনীয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন Detector। পরে ফের্মিল্যাবের টেভাট্রিন ও CERN এর LHC তে এই সংঘর্ষের আয়োজন করা হয়। বিশেষতঃ LHC-র ATLS এবং CMS এর পরীক্ষায় ২০০৮ এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োজনীয় উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কণার সংঘর্ষ সফল ভাবে ঘটানো সম্ভব হয়। তবে যন্ত্র চলার ৯ দিনের মাথায় কিছু যান্ত্রিক গোলযোগে প্রায় ৫০টির বেশী সুপার কনডাকটিং ম্যাগনেট সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও কাজ প্রায় ১৪ মাস পিছিয়ে যায়। অবশেষে ২০০৯ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি পুনরায় তার কাজ শুরু করে। এর মধ্যে ২০১১-র সেপ্টেম্বরে টেভাট্রন তার কাজ বন্ধ করে দেয় আর্থিক ব্যয় সংকোচনের কারণে। ২০১১ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে ATLS এবং CMS এর সংঘর্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় এবং পৃথক পৃথক ভাবে শুরু হয় হিগস্ বোসনের অস্তিত্বের সূত্র সন্ধানের প্রক্রিয়া। আর ডিসেম্বরের শেষের দিকে পাওয়া গেল অসংখ্য তথ্য যা সংরক্ষণ করা হল CERN সহ আরো একাধিক দেশের গবেষণাগারের কম্পিউটারে। অবশেষে ২০১২ -র ৪ঠা জুলাই, CERN এর ডিরেক্টর জেনারেল রলফ হয়্যারের ঘোষণা ভর প্রদানকারী কণার অস্তিত্ব তারা পেয়েছেন। দর্শকাসনে উপস্থিত স্বয়ং পিটার হিগস্। আবেগ প্রবন হয়ে পরে স্বীকার করলেন জীবদ্দশায় এমন হবে ভাবতে পারেননি। এভাবেই পদার্থ বিজ্ঞানে Standard-Model এর সাফল্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ হলেন।

বিজ্ঞানের এই সাফল্যকে সাধারণের কাছে তুলে ধরতে এবং বিজ্ঞানের গবেষণায় এই বিপুল অর্থ ব্যয় এর সপক্ষে জন সচেতনতার উদ্দেশ্যে CERN এর ডিরেক্টর জেনারেল (ডি.জি.) মাঝে মাঝেই যাচ্ছেন বিভিন্ন দেশে, LHC এবং CERN এর গবেষণার কথা জনপ্রিয় বক্তৃতায় তুলে ধরতে। এই বক্তৃতা তিনি প্রথম করেন রোমানিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের শহর কোলকাতাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টেনারী হলে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর এলেন CERN এর ডি.জি। সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ডিরেক্টর বিকাশ সিংহের সভাপতিত্বে তিনি রাখেন তার জনপ্রিয় বক্তব্য। বক্তব্যে উঠে আসে 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোট ভরের হারিয়ে যাওয়া প্রায় ৯৬ শতাংশ ভরের কথা। কারণ বিজ্ঞানীদের হিসাবে ব্রহ্মাণ্ডের মোট ভরের মোটামুটি ৪ শতাংশ রয়েছে বিভিন্ন ব্ল্যাকহোল, গ্যালাক্সি, নেবুলা তথা নক্ষত্র, গ্রহ প্রভৃতিতে যার কথা আমরা জানি। অধ্যাপক হয়্যারের মতে এই নতুন গবেষণালব্ধ তথ্য একদিকে যেমন বেসিক সায়েন্সকে এগিয়ে দেবে তেমনি হয়ত আমাদের পথ দেখাবে এই ৯৬ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে। আর কে বলতে পারে আজকের এই আপাতঃ নিরীহ আবিষ্কার হয়ত সূচনা করবে নতুন কোনো প্রযুক্তিবিদ্যার সোপান যা এক ধাক্কায় মানব সভ্যতাকে উন্নতির দিকে আরো অনেকটা এগিয়ে দেবে।

—ডঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাই স্কুল, কোচবিহার - মোঃ- ৯৪৩৪৩৭৭০৬৭

ঘরের বাতাস দূষণের শিকার

1 পাতার পর

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে রান্নার জন্য গ্যাস, ফ্রিজ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। কোনটাই সৌখিনতার জন্য নয়। প্রাত্যহিক গতিশীল জগতে অপরিহার্য। যাদের আর্থিক অবস্থা যেমন, তারা সেভাবেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেয় ঘর বাড়ি। আধুনিক চিন্তা-ভাবনা ও রুচি পরিবর্তন এনে দিয়েছে টবে গাছ লাগিয়ে ঘর সাজানো যাকে 'ইন্ডোর ডেকোরেশন' বলে। কিন্তু ঘরের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা অনেক সময় চিন্তা ভাবনায় আসে না। যার ফলে প্রায়ই শোনা যায় গৃহস্থের নানা রকমের রোগ ব্যাধির কথা। এজন্য অভ্যন্তরীন দূষণই দায়ী। সে মানসিক হোক বা দৈহিক যা হোক না কেন।

দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরুষ মহিলা সমভাবে সর্বত্র বিরাজ করছে। চাকুরী নিয়ে মেয়েরা পুরুষের মত অর্থ রোজগারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক এক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সকাল থেকে যা যার কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। ফিরে আসে সেই সন্ধ্যেবেলা ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে। অনেক সময় স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে, অনেক সময়, ফেরার সময়টাকে দেরী করে দেয়। এই দীর্ঘসময় সন্তান কোন পরিচারক বা পরিচারিকার হেফাজতে থাকে। কর্মক্ষেত্র থেকে বাবা মা ফিরে আসার পর হয়ত কিছু কিছু কথাবার্তা বলে যেগুলো সন্তানের মনের মধ্যে দাগ কাটতে থাকে। বাবা হয়ত ক্লান্তি এড়াতে একটা বিড়ি বা সিগারেট ধরালো আর সন্তান এসে বাবার আদর, স্নেহ পেতে চাইল, এখানে ওই সিগারেট ধোঁয়া সন্তানের প্রভূত ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা মায়ের আচার-আচরণ সন্তানকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সন্তান ওই সময় পরিচারক বা পরিচারিকাকে বেশি আপন ভাবতে শুরু করে। এ এক পরিবারিক দূষণ। তারপর বাবা যদি সুরায় আসক্ত হয় তাহলে তো কথাই নাই।

রান্নার সময় আমিষ বা নিরামিশ যাই রান্না হোক না কেন, তার থেকে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই সকল গ্যাসকে পলিসাইক্লিক অরগ্যানিক মেটিরিয়ালস বা পি.ও.এম. বলা হয়। রান্না ঘরটি অপরিসর। উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নাই। যার ফলে ওই পি.ও.এম. বসারঘর ও শোয়ার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে ওই সিগারেটের ধোঁয়া মিলে মিশে স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও রান্নাঘরে একজস্ট বসায়, কিন্তু তা ক'জন।

শুধু তাই নয়, রান্নার জন্য গ্যাস চুল্লির প্রচলন হয়েছে। এই জ্বালানি গ্যাস থেকে কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তা সহজে কিন্তুঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। শীতকাল হলে তো কথাই নেই সব জানলা দরজা বন্ধ করে দেয়। মশার হাত থেকে রক্ষা পেতে ধূপ জ্বালিয়ে ঘরে থাকা। এসব মিলিয়ে বিষাক্ত বায়ুর আধারে বিপন্ন সকলে। তাৎক্ষণিক কিছু ধরা না পড়লেও ধীরে ধীরে শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফুসফুসের রোগ, মাথা ধরা, হাঁপানি আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলে। ঘরে প্রচুর পরিমাণ আসবাবপত্র থাকে, তার সঙ্গে বসার ঘরে কার্পেট যদি পাতা থাকে, তা ঠিকমত পরিষ্কার করা হয় না। যদি ঘরে ফুলদানি থাকে তাতে ফুলের পরাগরেণু ইত্যাদি হয়। এবার ঘর ঝাড়পোছ করার সময় পরাগরেণু, ধুলা ময়লা উড়ে নাকের মধ্যে ঢুকলেই ঘন ঘন হাঁচি হয়। শহরে বাড়ির লোকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু দীর্ঘদিন এভাবে চললে 'ডাস্ট এলার্জি' ও হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

শহরের ঘরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেগুলি বেশ কাছাকাছি হওয়ার ফলে বায়ু চলাচল ভালমত করতে পারে না। তার উপর যদি নীচু ছাদ হয় এবং সর্বোচ্চ ছাদ যদি জল ছাদ দেওয়া না হয় তাহলে গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপ ওই ছাদ শোষণ করে নেয় এবং তা মাঝ রাত অবধি থাকে এবং ওই তাপ সিলিং ধরে রাখে এবং ঘরের ভিতর এক প্রচন্ড গরমের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ওই সময় রক্তচাপ (উচ্চ) ও হার্টের রোগী কষ্ট পায়। এ একপ্রকার দূষণ। একে তাপীয় দূষণ বলে। অনেক ঘরগুলিতে মোজাইক টাইল বসায়। তাও ক্ষতিকর। ওই মোজাইক পাথর থেকে র‍্যাডন গ্যাস বার হয়, যা মারাত্মক ক্ষতি করে।

আমরা চিৎকার করছি দূষণ নিয়ে। কিন্তু ঘরের দূষণ যে তার চেয়েও ভয়ানক তা কিন্তু ভাবি না। তাই সব দূষণের সঙ্গে সঙ্গে এ দূষণের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা কম হলেও ক্ষতি কি? সবাই মিলে ভাবলে একটা সমাধান নিশ্চয় বার হয়ে আসবে।

—কাননকুমার প্রামাণিক, মোঃ-৯১৫৩২৯২২৩২
নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

পিঁপড়েদের সমাজ জীবন

1 পাতার পর

পারে খাবার বয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। পিঁপড়ে খুবই বলিষ্ঠ তাই নিজ দেহের তুলনায় অনেক ভারী জিনিসও অনায়াসে বয়ে আনতে পারে। এরা উদ্ভিজ এবং প্রাণীজ সব রকম রসই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তবে মিষ্টি জিনিসই বেশি পছন্দ করে।

বিপদের সম্ভবনা দেখা দিলে যেমন বর্ষাকালে বাসায় জল ঢুকে যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলে শ্রমিক পিঁপড়েরা প্রত্যেকেই একটি করে ডিম মুখে নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দলে দলে ছুটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। বর্ষাকালে এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। সৈনিক পিঁপড়েরা সাধারণভাবে প্রহরীর কাজ করে এবং আততায়ীর আক্রমণ থেকে উপনিবেশ রক্ষা করে। আর বিপদকালে প্রয়োজন হলে যোদ্ধার কাজ করে।

পিঁপড়ে সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে। প্রবল আক্রান্ত একদল পিঁপড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পিঁপড়েদের রাজ্য আক্রমণ করে। তখন দু'দল পিঁপড়ের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। বহু সৈন্য মারা যায়, অনেকেই আহত হয়। কিন্তু একদল একেবারে হেরে না যাওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধ থামে না। যুদ্ধে জিতলে বিজয়ী পিঁপড়ের দল মৃত সৈনিকদের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে যাতে সহজেই বহন করে নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এরা পরাজিত শত্রুদের রাজ্যে প্রবেশ করে, তাদের সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য ডিম ও বাচ্চা সব লুঠ করে নিয়ে আসে। এরা কিন্তু ঐ সব বাচ্চাদের সযত্নে লালন পালন করে।

উদ্ভিদ পরিচিতি ঃ নন্দী বৃক্ষ

তুন - CEDRELA TOONA. Roxb.
toona ciliata

অন্য নামে ঃ বাংলা-হিন্দি-উর্দু তুন, ইংরেজী Monlemiu Cedar, Toon Tree, ওড়িয়া-মহালিঙ্গু, তামিল-তুনু থারাম, সংস্কৃত-তুন, নন্দীবৃক্ষ, তেলেগু-মান্দী চেট্টু ও গলিমানু, কন্নড়-কেম্পু গন্ধা ঘেরি।

নামকরণ ও বিজ্ঞান ঃ Cedrela কথাটি এসেছে Cedrws থেকে 'CEDRUS' কথাটি ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি গাছের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যা ইংরেজীতে দাড়ায় 'CEDAR' আর 'Toona' হচ্ছে ভারতীয় তুন শব্দের ল্যাটিনীকরণ।

সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত নিম্ন হিমালয় অঞ্চল আর চট্টগ্রাম, আসাম, ছোটনাগরপুর গঞ্জাম, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, নীলগিরি ও আন্নামালাই এ সহজাত।

পরিচিতি ঃ তরতরিয়ে বেড়ে ওঠা একটি প্রায় পর্ণমোচী বৃক্ষ; উচ্চতায় ২০-৩০ মিটার। বাকল, গাঢ় ধুসর অথবা লালচে বাদামী রঙের এবং ঝাকড়া শীর্ষ দেশযুক্ত। বাকল মাঝে মাঝে ফাটলযুক্ত, ভেতর দিকটি লালচে বাদামী হয়ে থাকে। সদ্য সদ্য ব্লেজ করলে লাল আর সাদা দাগযুক্ত তবে কিছুক্ষণ পরে রং পালটে বাদামী হয়ে যায়। স্বাদে তেতো। যে রস ক্ষরণ হয় তা কাটারীর গায়ে লাল আস্তরণ ফেলে।

পাতা — প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা, পত্রিকাগুলি আকারে বল্লমের মত লম্বায় ১০-১৫ সেন্টিমিটার আর চওড়ায় ৮-১০ সেন্টিমিটার। পত্রিকা থাকে ১০-২৫ জোড়া, তবে মাথায় একটি বিজোড় পত্রিকা থাকে। আগার দিক দীর্ঘাগ্র এবং ধার ঢেউ খেলানো, মসৃণ, নতুন শাখায় ক্রীম রঙের ফুল হয়।

ফুল — মধু গন্ধযুক্ত, ২ সেন্টিমিটার মত লম্বা যৌগিক ভাবে সাজানো থাকে। বৃতি ৫টি, দল ৫টি যুক্ত পুঃ কেশর ৫টি।

ফল— ক্যাপসুল ২ সেমি লম্বা, তাতে হাল্কা বাদামী বাদামী ২ দিকে পাখাওয়ালা বীজ থাকে। পাখা সহ বীজ পুরু ১.২৫-১.৫০ সেমি. লম্বা।

আর্বতন — উত্তর ভারতে ডিসেম্বর মাসে পত্রমোচন শুরু হয় এবং জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে প্রায় পাতাহীন হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল ফোটার সময় পাখাওয়ালা বীজগুলি বছরে বিভিন্ন সময় ফল ফেটে বেরোয়, খুব হালকা তাই বায়ু তাড়িত হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে যায়। আর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে মে মাসে ফুল আসে আর মার্চ থেকে অক্টোবর মাসে ফল পেকে যায়।

উদ্যান চর্চা — বীজ থেকে খুব সহজেই চারা উৎপন্ন করা যায়। উদ্যানে লাগানোর জন্য একটি ভাল গাছ, হালকা লাল নতুন পাতার সঙ্গে সাদা ফুল দেখতে বড় সুন্দর লাগে।

উপকারিতা — কাঠের সারভাগ কালচে লাল রঙের আসবাব পত্র তৈরী তো করাই যায় তাছাড়া রিক্সার বডি তৈরীর জন্য খুবই দরকারী কাঠ। এই কাঠ হালকা ও শক্ত তাছাড়া এই কাঠ বেকরে তবু ভাঙ্গবে না।

ঔষধি মূল্য — নন্দীবৃক্ষ কটুস্তিক্ত : শীত-স্তিক্তাগ্ন দাহনিত। অর্থাৎ এর স্বাদ কটু, তিক্ত, এটি শীতবীর্য্য এবং বিপাকেও তিক্ত; দাহ প্রশমন কারী।

লোকায়তিক যোগ ঃ যারা পুরাতন আমাশয় ভুগছেন তাদের জন্য এই গাছের ছাল খুব উপকারী। বয়স হিসাব করে জলের মাত্রা ঠিক রেখে নিতে হবে। পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা ৫-১০ গ্রাম সেই মত ছাল সিদ্ধ করে জল খেতে হয়। যাদের মাসিক পরিষ্কার হয় না তাঁরা তুন ফুল ও প্রাম সিদ্ধ করে কয়েকদিন খেলেই ওটি স্বাভাবিক হবে।

যে সব উদ্যানে আছে — বালুরঘাট এবং বীরপাড়া উদ্যানে এখনও আছে হয়ত। লাটাগুড়ি উদ্যানেও শেষ একটি গাছ ছিল এখন নেই।

লেখক ঃ— প্রণবেশ কুমার চৌধুরী, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি, ফোন-৯৯৩২৮৯১৯০৪

সূত্র নির্দেশ ঃ—
১) চিরঞ্জীব বনৌষধি— আয়ুর্বেদাচার্য্য শিবকালী ভট্টাচার্য্য
২) বেঙ্গল প্ল্যান্ট — ডেভিড প্রাও
৩) Forest Flora. Indian Tress - D.Brondos
৪) The book of Indian Tress - K.C.Sahni
৫) Glossary of Indian Medicinal Plants - Chopra & Nayar.

চিঠি

মহাশয়,

পত্রিকা পাঠাবার জন্য প্রথমেই রইল ধন্যবাদ। প্রাপ্তি স্বীকারে চিঠি ছাড়াও একটি লেখা পাঠিয়ে দিলাম। পত্রিকা চালানো সহজ নয়। এর ওপর বিজ্ঞান বিষয়ক। কাজেই সঙ্গে এক বছরের গ্রাহক চাঁদাও পাঠিয়ে দিলাম। পত্রিকার সকলে ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

—ধন্যবাদসহ সোমা সেনাপতি, ধরমপুর খেলার মাঠ (উঃ), চুঁচুড়া, হুগলী, পিন-৭১২১০১, মোঃ-৯২৩১৩৫১৭৯০

পড়ুন ও পড়ান
'এবং কি কে ও কেন'
(জনপ্রিয় বিজ্ঞানের জনপ্রিয় ত্রৈমাসিক)
যোগাযোগ ঃ- প্রকাশ দাস বিশ্বাস, কার্যকরি সম্পাদক
'এবং কি কে ও কেন'। মূল্য ঃ ১৫ টাকা
গ্রাম ও ডাক - চালতিয়া, ভায়া বারুইপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
সূচক -৭৪২১৬৫, ফোন ঃ ৯৪৭৪৬৪৩৮৩৫

গণিতবিদ হরিশ চন্দ্র : এক মহাজীবনের অধিকারী ছিলেন

আধুনিক সময়কালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় গণিতবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে গ্রাহ্য হন হরিশ চন্দ্র। প্রথমে অবশ্য আছেন শ্রীনিবাস রামানুজন।

হরিশ চন্দ্রের গণিত গবেষণার কাজ যথেষ্ট উচ্চমার্গের এবং তা বুঝতে উচ্চতর গণিত জ্ঞানের আবশ্যক। গণিতবিদ পরিমন্ডলে তিনি gifted individual হিসাবে পরিগণিত হন।

ওঁর জন্ম বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কানপুরে (১১-১২-১৯২৩) পিতা চন্দ্রকিশোর, মাতা চন্দ্ররানি (বাপের বাড়ির নাম সত্যগতি শেঠ)। তিন ভাই ও এক বোনের পরিবারে তিনিই বড়ো। বাবা ছিলেন সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এবং কট্টর গান্ধীবাদী। জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার কারণে নিজের পদবি বিসর্জন দেন।

দাদু (মায়ের বাবা) ছিলেন উকিল। প্রাথমিক পড়াশুনা শুরু মামার বাড়িতে। স্কুলে ভর্তি হন সরাসরি সপ্তম শ্রেণিতে নয় বছর বয়সে। স্কুলের পড়া শেষ করে কানপুরে বিএনএসডি ইনটার কলেজে ভর্তি হন। পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (১৯৪১) ও এম এসসি (১৯৪৩) পাশ করেন। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী পি. এ. এম. ডিরাকের গ্রন্থের সংস্পর্শে আসেন। পড়তে পড়তে তিনি স্থির করেন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। এলাহাবাদে তিনি খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী কে. এস. কৃষ্ণানের সংস্পর্শে আসেন। ওঁর পরামর্শেই হরিশ চন্দ্র ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চলে আসেন এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি ভাবার তত্ত্বাবধানে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি দু'বছর ছিলেন এবং কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এইসব গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ডিরাকের নজরে আসেন। পরে ভাবা ও কৃষ্ণানের সুপারিশে তিনি পদার্থবিজ্ঞানী ডিরাকের কাছে গবেষণার জন্য যাত্রা করেন (১৯৪৫)।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডিরাকের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ উৎসাহে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার গবেষণায় নিমগ্ন হন। ১৯৪৭ সালে তিনি পিএইচডি উপাধি প্রাপ্ত হন।

হরিশ চন্দ্রের জীবনে একটা নতুন সুযোগ এলো। ডিরাক যাচ্ছেন আমেরিকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান প্রিন্সটনের অ্যাডভান্স স্টাডি প্রতিষ্ঠানে (১৯৪৭-৪৮)। হরিশ চন্দ্র সঙ্গে যাবেন সহকারী হিসাবে। এখানেই ঘটল তাঁর জীবনের মূল্যবান দ্বিতীয় রূপান্তর। তিনি খ্যাতনামা গণিতজ্ঞদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। প্রতিভাধর আন্তর্জাতিক গণিত বিজ্ঞানীদের সাহচর্যে হরিশ চন্দ্রের গবেষণার ভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটলো। এবারে তিনি ঠিক করলেন; না পদার্থবিদ্যা নয়, তাঁর নতুন গবেষণার ধারা শুরু হবে গণিতে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন 'প্রিন্সটনে এসে উপলব্ধি করলাম যে লোরেঞ্জ গ্রুপের উপর আমার কাজ বেশ হাল্কা গোছের। গোড়ায় না গিয়ে কিছুটা উপর উপর দেখার চেষ্টা করেছি। আমি একবার অধ্যাপক ডিরাককে জানিয়েছিলাম যে আমার প্রমাণগুলি তেমন জোরালো নয়। উত্তরে তিনি বলেন, "I am not interestd in proofs but only in what nature does." এই কথা থেকে আমি গভীর ভাবে উপলব্ধি করলাম পদার্থবিজ্ঞানী হতে গেলে সুবেদী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকা দরকার। তাই ঠিক করলাম গণিতেই মনোযোগ নিবিষ্ট করবো।'

অবশ্য এজন্য তাঁকে কোন সময় নষ্ট করতে হয়নি। পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র একে অপরের উপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল। তাঁর শেষ পদার্থবিদ্যার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে এবং গণিতের উপর গবেষণাপত্র প্রকাশ শুরু হয় ১৯৪৯ থেকে।

এবার ডিরাক ফিরে গেলেন কেমব্রিজে। কিন্তু হরিশ চন্দ্র রয়ে গেলেন আমেরিকায়। আরও এক বছর প্রিন্সটনে; পরে হার্ভার্ডে (১৯৪৯-৫০)। এরপর এলেন কলম্বিয়ায়, কাটালেন ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ অবধি. এইখানে থাকাকালীন তিনি কাজ করেছেন মুম্বাইয়ের টি.আই.এফ.আরে. (১৯৫২-৫৩), ফের প্রিন্সটনে (১৯৫৫-৫৬) এবং বিখ্যাত ক্লেন ফেলো হিসাবে ১৯৬১-৬৩, প্যারিসে গুগেনহাইম ফেলো ১৯৫৭-৫৮। ১৯৬৩ থেকে তিনি স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি প্রতিষ্ঠানে এবং মৃত্যু অবধি এখানে থেকেছেন।

১৯৭৩-এ তিনি এফ আর এস সম্মানে ভূষিত হন। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের ফেলো (১৯৮১) এবং ইনসা ফেলো (১৯৭৫)। এছাড়াও কোলেপ্রাইজ (১৯৫৪), আমেরিকান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি; রামানুজন মেডেল (১৯৭৪), ইনসা, নিউ দিল্লি; সাম্মানিক ডকটোরেট উপাধি — দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১)। তাঁর সম্মানে গণিতের একটি উচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এলাহাবাদে Harish Chandra Research Institute of Mathematical Sciences। এটি ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি দপ্তরের অধীন।

ওঁর জীবনের সিংহভাগ বিদেশে কাটলেও মানুষটি মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি ভারতীয়। প্রচলিত সংস্কার মেনে না চললেও ধর্ম সম্বন্ধে ওঁর বিশেষ একটা মনোবৃত্তি ছিল। ব্যক্তি জীবনে কঠোর ভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। ছোটোবেলায় ছবি আঁকায় উৎসাহী ছিলেন। ফরাসি ইমপ্রেশানিস্ট গোষ্ঠীর প্রভাব তাঁর উপর ছিল। ওঁর কন্যা প্রেমালা লিখেছেন, বাবা ছিলেন গভীর ভাবে ভারতীয় আদর্শে প্রানিত ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

১৯৮৩, ১৬ অক্টোবর প্রিন্সটনের এক সভায় তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

—দীপক কুমার দাঁ, মোঃ-৯৪৭৪১৯২৭৯৯

অন্ধকার দূরীকরণে

একদা বাংলার মাটিতে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রসুন্দর, মেঘনাথ সাহা, পরশুরাম প্রমুখ মনীষীরা এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের লেখনী, কর্ম ও সাধনা দিয়ে যুক্তি-চৈতন্যের, বিজ্ঞান মনস্কতার বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন। কিন্তু হায়, আজ তাঁদের কর্মভূমি স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতদিন পরেও নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বদ্ধ জলাশয়ে। সাক্ষরতা বাড়লেও মুক্ত চিন্তার পরিসর বাড়েনি। আশা করা গিয়েছিলো মার্কসবাদীদের রাজত্বে কিছুটা হলেও যুক্তিবাদের প্রসার ঘটবে। কিন্তু দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনেও যুক্তিবোধ সম্পন্ন মানুষদের নিরাশই হতে হলো। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে বামফ্রন্টের তফাত বোধগম্য হল না। যথারীতি The Drugs & Magic Remedies Act, 954 প্রয়োগ করা হলো না, কোন নেতার বক্তৃতায় কুসংস্কার বিরোধী একটা শব্দও শোনা গেলো না। ধর্ম-জাত-বর্ণের বৈষম্য পুরোপুরি ঘোচেনি। ধর্ম-পূজা-গুরুদেব-ভাগ্য নিয়ে মানুষের উন্মাদনা ও অসভ্যতা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। এমনকি বহু শিক্ষিত মানুষও দেখা যায় যুক্তিবোধহীন, ছেলেমানুষী বিশ্বাসে আবদ্ধ। আলোর পথ ত্যাগ করে অন্ধকারের দিকে যাত্রা। কেন?

কারণ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই রয়েছে বৈষম্য, ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাবার উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামো চাই। যুক্তিবাদীদের জীবনী ও কর্মকান্ড অবশ্যপাঠ্য হওয়া চাই। প্রাথমিক স্তর থেকে চাই বিজ্ঞানশিক্ষা। বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞানমেলা, বিজ্ঞান ভিত্তিক ম্যাজিক ও খেলা, অলৌকিক নয় লৌকিক প্রদর্শনী, জ্যোতিষী-বাবাজী-তান্ত্রিকদের ধোঁকাবাজীর খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে জ্বলবে যুক্তির আলো, উন্মোচিত হবে প্রকৃত সত্য। উদ্যম ও উৎসাহ প্রয়োজন। প্রয়োজন চেতনা সম্পন্ন প্রকৃত শিক্ষক যিনি শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে জাগ্রত করতে পারেন, বাঁধা ধরা বিশ্বাসের নাগপাশ থেকে বিদ্যার্থীকে মুক্ত করতে পারেন। অজ্ঞানতাকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করতে বৃক্ষ ও পরিবেশ সচেতনতা, সমাজ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সাপ-ভূত প্রভৃত বিষয়ে ভুল ধারনা ও ভয় ভাঙ্গানো নিতান্ত জরুরী। শিশু বয়স থেকে শেখাতে হবে ঈশ্বরচিন্তার চেয়ে মানবচিন্তাই বড়। শেখাতে হবে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে স্বার্থের তাগিদে, দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছে ভীতি এবং উর্বর মস্তিষ্ক শোষক শ্রেণীর কল্পনা থেকে।

সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে উন্মোচিত করতে হবে প্রকৃত শিক্ষার সিংহদুয়ার। কুসংস্কার নির্মূল করতেই হবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন-যুক্তিবাদবিরোধী চিন্তাধারা, যুক্তিহীন ঈশ্বরভজনা এবং ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের সন্তান সন্ততি ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী হিংসা। সুতরাং আজকের হিংসা, শোষণ ও নৈরাজ্যকে দূর করতে গেলে প্রশাসনকে সচেতন হতেই হবে, প্রচলন করতে হবে বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষার। বিজ্ঞানের কারিগর নয়, চাই প্রকৃত বিজ্ঞানী। চাই শ্বাসরোধী নাগপাশ থেকে মুক্তির দাওয়াই।

—বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, মানকুন্ডু, হুগলী, মোঃ-৯৪৩২১০০১৪৮

বিজ্ঞান প্রদর্শনী মতামত

১) আমি এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ১০/১১/১২ এপ্রিল ২০১২ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়োজক ছিল চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। বিজ্ঞানের মজা, জলদূষণ, রঙ মেশানো খাওয়ার ফলে বিভিন্ন রোগ, কুসংস্কার, মরণোত্তর দেহ দান ও চক্ষুদান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি এবং আমাদের স্কুলের বহু ছাত্রী এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করিবিজ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে না রেখে মানুষের মাঝে আনতে হবে তবেই না মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ গড়ে উঠবে। তাই এই রকম করে অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। আর বিজ্ঞানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। — অনন্যা রক্ষিত, দশম শ্রেণী, ঘুগিয়া, ভুবনমোহিনী বিদ্যালয় (উঃমাঃ) চাকদহ, নদীয়া।

২) আমাদের স্কুলে গত ১০/১১/১২ এপ্রিল ২০১২ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়োজক ছিল চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। বিজ্ঞানের মজা, জলদূষণ, রঙ মেশানো খাওয়ার ফলে বিভিন্ন রোগ, কুসংস্কার, মরণোত্তর দেহ দান ও চক্ষুদান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি এবং আমাদের স্কুলের বহু ছাত্রী এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নাম দিয়ে খুব খুশী হয়েছি এবং যারা এতে নাম দিয়েছে তারাও খুব খুশী হয়েছে। —পম্পা হালদার, দশম শ্রেণী, ঘুগিয়া, ভুবনমোহিনী বিদ্যালয় (উঃমাঃ) চাকদহ, নদীয়া।

সংবাদ

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রকৃতি বিজ্ঞানী অবনীভূষণ ঘোষ (সর্পবিদ)-এর জন্ম শত বর্ষে ২৫-১১-২০১২, রবিবার, চাকদহ রামলাল একাডেমীতে (পুরাতন ভবন) এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রণতোষ চক্রবর্ত্তী এবং বিজ্ঞান লেখক দীপক কুমার দাঁ।

আয়োজক সংস্থা চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষে বিবর্তন ভট্টাচার্য্য বলেন বিজ্ঞানী অবনিভূষণ ঘোষ সারা জীবন ধরে সাপ নিয়ে গ্রাম গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

অধ্যাপক রণতোষ চক্রবর্ত্তী অবনিভূষণ ঘোষের জীবনের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করেন। দীপক কুমার দাঁ সাপ নিয়ে বিভিন্ন বইয়ের সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিত দাস ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার জয়দেব দে জানান আগামী দিনে অবনিভূষণ ঘোষকে নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।

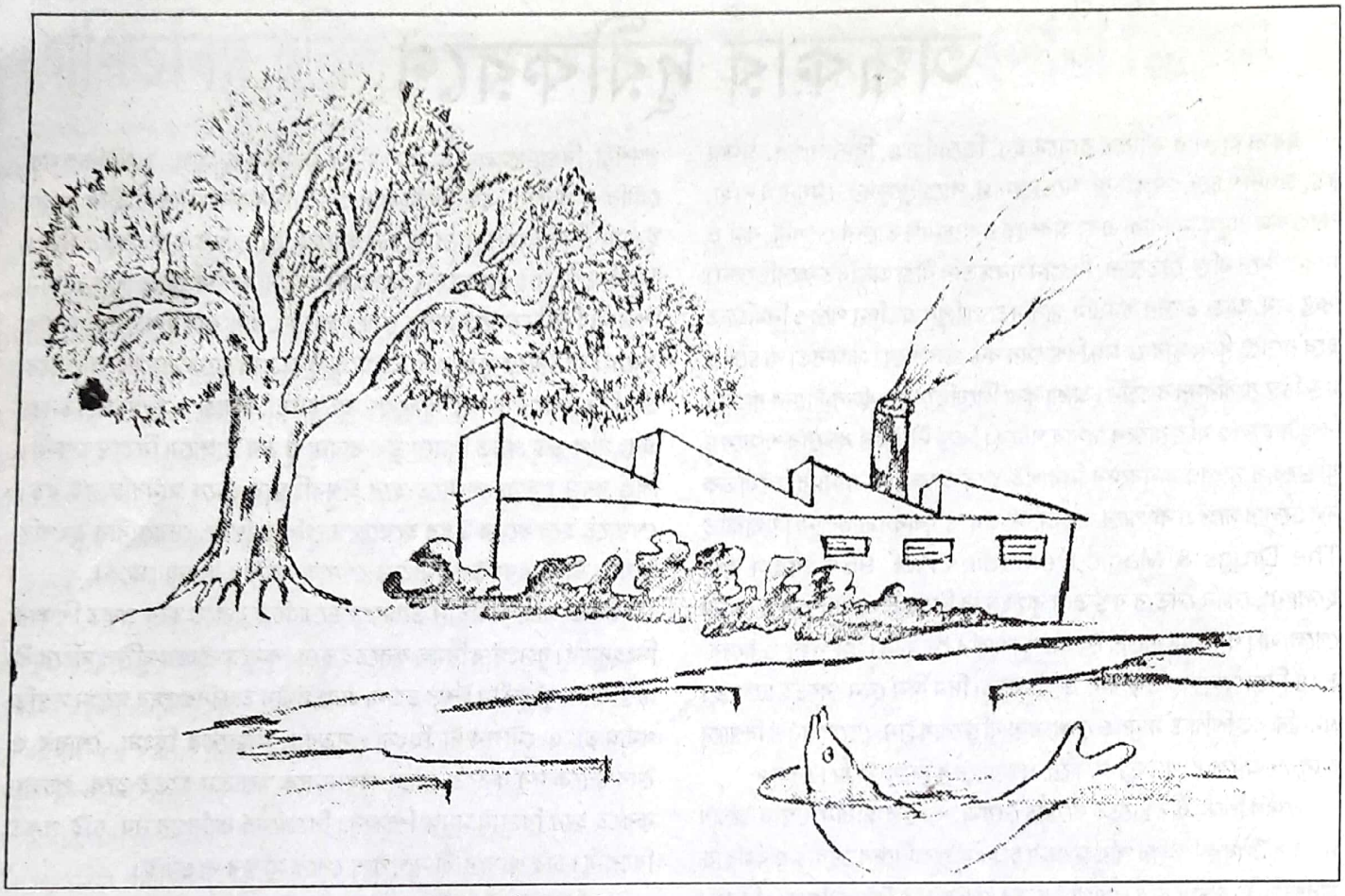

চুর্ণি নদীর দূষণ চিত্র

বাংলাদেশের চিনি কোম্পানীর কালো (দূষিত) জল ছাড়বার ফলে কালো গুগুকদের বেঁচে থাকা কঠিন। জলে অক্সিজেনের পরিমান কমে গেলে কি করবে ওরা। একটি শিশুর ভাবনা। সুপ্রিয় পাল, শ্রেনি সপ্তম, চাকদহ রামলাল একাডেমী, চাকদহ, নদীয়া

বিজ্ঞান দরবারে ২৩ তম বার্ষিক সম্মেলন

৯ ডিসেম্বর ১২, রবিবার বিজ্ঞান দরবারের ২৩ তম বার্ষিক সম্মেলন কাঁচরাপাড়া অ্যালবাটস স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। বিগত ২ বছরের সংস্থার কাজ কর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। সম্পাদক সুরজিৎ দাস ও সভাপতি ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-১১, ২০১১-১২ বছরের বার্ষিক হিসাব (অডিট) ও বাৎসরিক ক্যালেন্ডার পেশ করেন।

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি

৪ আগষ্ট, কলকাতা বাগমারি মানিকতলা সরকার পোষিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনে প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রতিকৃত ড. গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের ১১৭ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. সুমিত্রা চৌধুরী, মিহির কুমার ভট্টাচার্য, মানবি গুপ্ত, ইলা সেনগুপ্ত, রেখা দাঁ, ড. শতাব্দী ঘোষ ও ড. সোমা বসু প্রমুখ।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in